জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস ISSN 2519-5816
ভলিউম-১৫, সংখ্যা-১ DOI : https://doi.org/10.3329/jnujarts.v15i1.87697
জানুয়ারি-জুন ২০২৫ Page: 54-64

বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

দেবশ্রী দোলন*

Abstract

Film is an important subject in the Bengali entertainment world in terms of art theory. In the late 19th century, cinema entered the entertainment world with the help of the Lumiere Brothers of Paris as a carrier of technological development. The tide of this development came to the Indian subcontinent with the help of filmmaker Hiralal Sen. Meanwhile, another legend of the subcontinent, Rabindranath Tagore, has roamed in all branches of literature in his life. In continuation of this, his great interest in films was also revealed. Along with the ease of acting in films, he also gave permission to use his songs in films. Basically, according to the context of the story, the use of Rabindra Sangeet in the film scenes can be observed in a combination of emotion and art. Even in the case of various political changes in the country at different times, Rabindra Sangeet has been used as a message of movement through films. Over the years, not only commercial story-based films, but also films based on Rabindra's stories have been used fluently. In keeping with the current era, the fluent use of Rabindra Sangeet in various story-based non-commercial films or art films is also noticeable. Although there are differences of opinion about the variety of instrumental accompaniment, this type of Rabindra Sangeet has gained considerable popularity among a certain generation. Such unhesitating use of Rabindra Sangeet in an attempt to make subcontinental films world-famous has taken the 21st century to another level. This article will show how much the unrivaled use and acceptance of Rabindra Sangeet in modern films has enriched the film world, including Rabindra Sangeet, through the efforts of filmmakers, artists, technicians, exhibitors, writers and other concerned parties.

মুখ্যশব্দ: রবীন্দ্রনাথ, চলচ্চিত্র, রবীন্দ্রসংগীত, পরিচালক, দর্শক

* সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ।

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আকাশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক জাজ্বল্যমান নক্ষত্র। তাঁর রচিত গান বাংলা ও বাঙালির বিনোদনের অন্যতম উৎস। সংস্কৃতির মাধ্যমে মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান বাঙালির মনে-প্রাণে এক অবিমিশ্র উপলব্ধি সৃষ্টি করে। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বিংশ শতাব্দীর ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তা দর্শক বা শ্রোতার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। ২০০১ সালে রবীন্দ্রসংগীতের কপিরাইট উঠে যাওয়ায় দৃষ্টিভঙ্গি, চেতনা উপলব্ধি তথা প্রায়োগিক কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। যার ফলস্বরূপ শিল্পের মাধ্যম হিসেবে ভারতীয় চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত, চলচ্চিত্র হলো মানুষের শ্রবণ ও দর্শনের সম্মিলিত বন্ধনের চিত্রমাধ্যম। কোন ভৌগলিক সীমারেখায় আবদ্ধ না হয়ে বর্তমানে বিভিন্ন ধারার চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে । যার সূচনা হয়েছিল নির্বাক যুগের সময় থেকেই। তারই ধারাবাহিকতায় কাহিনির পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্রের দৃশ্যে ভাব ও শিল্পের সমন্বয়ে রবীন্দ্রসংগীতের সংযোজন শুরু হয়। রবীন্দ্রসংগীতের এরূপ ব্যবহার চলচ্চিত্রের গ্রহণযোগ্যতাকে আরও বর্ধিত করে।

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে তাঁর নিজস্ব রচনার বিভিন্ন ধারায় ব্যবহার করলেও চলচ্চিত্রে যে তা নিজস্ব অবস্থান তৈরি করবে সে সম্পর্কে তিনি হয়তো অবগত ছিলেন না। সময়ের বিবর্তনে রবীন্দ্রসংগীত আজ এক শ্রেণির মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী, মানসিক প্রশান্তির রসদ। বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার তেমন দেখা না গেলেও বর্তমান প্রজন্মে উদ্ভাবিত আর্টফিল্ম বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য নির্মিত চলচ্চিত্রে প্রসঙ্গ অনুযায়ী রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কিন্তু পূর্বের তুলনায় রবীন্দ্রসংগীতের অনুষঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের প্রায়োগিক বৈচিত্র্য বেশ দৃঢ়ভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। এতে রবীন্দ্রসংগীতের ভাব ও আবেদন যথাযথভাবে কখনও বজায় থাকছে, কখনও থাকছে না। যার ফলে দর্শকমনেও এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে। যা সুদূর ভবিষ্যতে রবীন্দ্রসংগীতের জন্য হুমকিস্বরূপ। দুই বাংলার চলচ্চিত্রেই রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণ উদ্‌ঘাটন ও এর প্রায়োগিক দিক বিশ্লেষণ করাই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহারকে আরও বেশি তথ্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে এই নিবন্ধে বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত রবীন্দ্ররচনা নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রের আলোচনাও করা হয়েছে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বপ্রণোদিত হয়েও কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয়ের প্রয়াস করেছিলেন। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা যে অক্ষুন্ন রয়েছে তার প্রমাণস্বরূপ দুই বাংলার প্রথিতযশা পরিচালকগণ চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তবে এই সময়ে এসে বিভিন্ন চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা কতটা তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ সংগীত হলো চলচ্চিত্রের কাহিনির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিনোদনের একটি উপাদান। তাই চলচ্চিত্রের কাহিনির সাথে কতটা সামঞ্জস্য রেখে রবীন্দ্রসংগীতের প্রয়োগ হয়েছে সেটাই মূল আলোচ্য বিষয় এই নিবন্ধে। এরই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে যথাযথ নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই নিবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার

উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলায় বায়োস্কোপের আবির্ভাব। ঢাকার অদূরে মানিকগঞ্জের বগজুরী গ্রামের হীরালাল সেন-এর প্রতিষ্ঠান রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানির মাধ্যমে বাংলায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর যাত্রা শুরু হয়।[১] প্যারিসের 'পাথে ফ্রেরেস স্টুডিও'র সদস্য অধ্যাপক স্টীভেনসন-এর কাছ থেকে ক্যামেরা ধার করে হীরালাল সেন প্রথম ছবি হিসেবে 'A Dancing scence' From the opera, 'The flower of Persia' তৈরি করেন। এর পরের বছর ১৮৯৮ সালে তিনি ভাই মতিলাল সেনকে নিয়ে রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানির যাত্রা শুরু করেন। কালের বিবর্তনে নির্বাক যুগের পরে ১৯৩১ সালে কলকাতায় সবাক চলচ্চিত্রের প্রচলন শুরু হলে বিভিন্ন পরিচালক এতে সংগীতের ব্যবহার শুরু করেন। ফলে সুর ও সংগীত ব্যবহারের অভিপ্রায় চলচ্চিত্রের ঘটনাক্রমকে বিশ্বাসযোগ্য ও অধিক বিনোদনমূলক করে তোলে। কারণ সংগীত দৃশ্যের একটি সংকেত বহন করে। সেই সংকেতের চাবি স্বভাবতই একজন চিত্র-পরিচালকের হাতে থাকে। আর তার পেছনে থাকে দৃশ্যের একটি সচেতন নকশা।

চলচ্চিত্র যে ধারারই হোক না কেন, তাতে ভালো গান থাকলে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। আর ভালো গানের কথা ও সুরের সমৃদ্ধ মেলবন্ধন যথার্থ খুঁজে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের গানে। শুধু রবীন্দ্রসংগীত নয়, রবীন্দ্রসৃষ্ট গল্প অবলম্বনেও প্রতিভাবান বাঙালি চিত্রপরিচালকগণ রবীন্দ্রনাথের নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প অবলম্বনে বেশকিছু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে নরেশ চন্দ্র মিত্র রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন' (১৯২৩) গল্প অবলম্বনে 'মানভঞ্জন' নামেই চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।[২] যার সংগীত পরিচালনায় ছিলেন মধু বসু। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের নাটক, উপন্যাস, গল্প অবলম্বনে আরো যেসব চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, তা হলো- 'বিসর্জন' (১৯২৭), 'গিরিবালা' (১৯৩০), 'নৌকাডুবি' (১৯৩২), 'ডালিয়া' (১৯৩০), 'বিচারক' (১৯৩২) প্রভৃতি। এসবের মধ্যে মধু বসু পরিচালিত 'মানভঞ্জন' ছোট গল্প অবলম্বনে দ্বিতীয় চলচ্চিত্র 'গিরিবালা'র চিত্রনাট্য দেখে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[৩]

উপনিবেশ আমলে, ১৯৩১ সালে কলকাতায় সবাক চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হয়। তবে সবাক চলচ্চিত্র-যাত্রার প্রথম দশ বছরে রবীন্দ্রসংগীতের কোনো ব্যবহার দেখা না গেলেও বাংলা টকির বরাতে দেখা যায় সংগীত পরিচালক হীরেন বসু রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার অংশবিশেষ সুরারোপ করে চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেন। কিন্তু চলচ্চিত্রে এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি। 'টকি'[৪] হচ্ছে বায়োস্কোপের অনুরূপ যন্ত্রবিশেষ। উনিশ শতকের শেষদিকে যন্ত্রপ্রযুক্তির বিকাশের কারণে নির্বাক ছবির সাথে কথা যুক্ত করা হয়। কালের বিবর্তনে টকি নাচ, গানের পাশাপাশি শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে সবাক চলচ্চিত্রের যুগে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' (১৯৩২) নাটক অবলম্বনে 'চিরকুমার সভা' চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। এর কিছুকাল পরে ১৯৩৭ সালে 'রাঙা বউ' চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালক কৃষ্ণচন্দ্র দে 'আমার সকল দুখের প্রদীপ' গানটি পূর্ণাঙ্গরূপে অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'মুক্তি'(১৯৩৭) চলচ্চিত্রে পঙ্কজ কুমার মল্লিকের সংগীত পরিচালনায় ৩টি রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়। তার মধ্যে 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে', এবং 'আমি কান পেতে রই' গান দুটি রবীন্দ্রনাথের রচিত হলেও 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানের সুর রবীন্দ্রনাথের সদয় অনুমতিক্রমে পঙ্কজ কুমার মল্লিক রচনা করেন। সেসময় কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ কুমার মল্লিক ছাড়াও রাইচাঁদ বড়ালও চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের

ব্যবহার করেন। তাঁদের হাত ধরেই বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের পটভূমি নির্মিত হয়। যে রবীন্দ্রসংগীত শুধুমাত্র শান্তিনিকেতন, কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ ও বাঙালি সমাজের উচ্চবর্গে গাওয়া হতো, তাকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সাধারণ বাঙালি সমাজে প্রচার করার ক্ষেত্রে এই সংগীত পরিচালকদের ভূমিকা অসামান্য। পঙ্কজ কুমার মল্লিকের সংগীত পরিচালনায় 'মুক্তি' (১৯৩৭) ছাড়াও 'জীবন মরণ' (১৯৩৯), 'ডাকঘর' (১৯৪০), 'অঞ্জনগড়' (১৯৪৮) প্রভৃতি চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার হয়। আবার সমসাময়িককালে সংগীত পরিচালক হিসেবে রাইচাঁদ বড়াল 'পরাজয়' (১৯৪০), 'অভিনেত্রী' (১৯৪০) 'পরিচয়' (১৯৪১), 'উদয়ের পথে' (১৯৪৪), 'মন্ত্রমুগ্ধ' (১৯৪৯) প্রভৃতি চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করেন। ১৯৩৮ সালে কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত পরিচালনায় 'গোরা' চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার হয়। সেসময় চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার নিয়ে একটি জটিলতা দেখা যায়। কিন্তু সংকট হয় নজরুলের সংগীত পরিচালনায় রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহারের শুদ্ধতা নিয়ে। বিশ্বভারতীর একদল সংগীতজ্ঞ এ বিষয়ে প্রশ্নও তোলেন। ফলে সুধী সমাজে তা প্রায় প্রকাশের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তবে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নজরুলের প্রতি অনুরক্ত থাকায় নজরুল ইসলামের নেয়া অনাপত্তি পত্রে নিজে স্বাক্ষর করে এই সংকটের অবসান ঘটান। যার ফলে যথাসময়ে 'গোরা' চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়।

চলচ্চিত্রের কাহিনি ও রবীন্দ্রসংগীতের সমন্বয়

সংগীত পরিচালকগণ শুধু দু'একটি গান নয় পুরো সিনেমার আবহ তৈরি করেন এমনভাবে যা দৃশ্যের সমন্বয় করে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। একটি সিনেমার কাহিনির গুরুত্বপূর্ণ অংশ ও কাহিনির মোড় ঘোরানোর জন্য গানের ব্যবহার করা হয়। ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' সিনেমার 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে', 'কোমল গান্ধার' চলচ্চিত্রে 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' , 'সুবর্ণরেখা' চলচ্চিত্রের 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়', সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সিনেমার 'এ পরবাসে রবে কে হায়' এবং 'জন অরণ্য' সিনেমার 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে', তপন সিংহের 'অতিথি' সিনেমার 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়', 'হাটে বাজারে' সিনেমার 'ওগো নদী আপন বেগে পাগলপারা' এবং অজয় করের 'মাল্যদান' সিনেমার 'ঘরেতে ভ্রমর এলো' প্রভৃতি চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার দৃশ্যকে নতুন মাত্রা দেয়। এছাড়া একই সঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালিত 'স্ত্রীর পত্র' চলচ্চিত্রতে 'বাংলার মাটি বাংলার জল', সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে বাইরে' চলচ্চিত্রের 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' এবং 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' চলচ্চিত্রে 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে' অথবা 'সুভাষচন্দ্র'তে 'তোমার আসন শূন্য আজি' প্রভৃতি রবীন্দ্রসংগীত অত্যন্ত সুচারুরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। সত্যজিৎ রায় ছাড়াও 'এ পরবাসে রবে কে হায়' গানটি এ যুগের পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষও তাঁর 'সব চরিত্র কাল্পনিক' চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেন। গানটি বাংলাদেশের প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার কণ্ঠে শোনা যায়। তবে বিভিন্ন চলচ্চিত্র সমালোচকদের মতামত অনুযায়ী এসকল বিখ্যাত পরিচালকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ই সর্বপ্রথম তাঁর রচিত ও পরিচালিত 'শাখা প্রশাখা (১৯৯০)' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের অগ্রসরমান চলচ্চিত্র চিন্তার সার্থক রূপ দান করেন। যেখানে রবীন্দ্রনাথের 'মরি লো, মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে' গানের কিয়দংশ শোনা যায়।

শুধু কাহিনির মোড় ঘোরানো নয়, অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার ভিন্নরূপেও দেখা যায়। যেমন- প্রথমটি, ট্রানজিশন বা রূপান্তর হিসেবে। এক্ষেত্রে কাহিনির ধারা অব্যাহত রেখে তার ছন্দ

গানে ব্যবহার করে কাহিনির সূত্রের উত্তরণ ঘটায়। একটি উদাহরণ দেখা যায়– 'তিনকন্যা' চলচ্চিত্রের 'বাজে করুণ সুরে' গানে। আর দ্বিতীয়টি, চলচ্চিত্রের অলংকার হিসেবে। বর্তমানে এই ধরনের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। এই ধারার প্রয়োগ দেখিয়েছেন তরুণ মজুমদার তাঁর 'শ্রীমান পৃথ্বিরাজ', 'ভালবাসা ভালবাসা' ও 'আলো' চলচ্চিত্রে। এসকল চলচ্চিত্রে মূল উপজীব্যই ছিল রবীন্দ্রসংগীত। এছাড়া 'নিমন্ত্রণ' চলচ্চিত্রে 'দূরে কোথাও দূরে দূরে' গানটিতে পরিচালক তাঁর চিত্রকল্পনা ও অনবদ্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন।

তৎকালীন সময় থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীরও বেশ কিছু চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহৃত হয়েছে। তখনকার শিল্পীদের সেই দৃপ্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠ রবীন্দ্রগানের গায়কীতে এক অন্য মাত্রা দান করেছে। তখনকার সময়ে 'ডাক্তার' চলচ্চিত্রে 'কী পাইনি তার হিসেব মেলাতে' গানে রবীন্দ্রসংগীতের কিংবদন্তী শিল্পী পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠ রবীন্দ্রসংগীতের ভাবধারাকে অন্য ভুবনে নিয়ে গেছে। 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' চলচ্চিত্রে শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এর কণ্ঠে 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' গানটি চলচ্চিত্রকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এছাড়াও 'দাদার কীর্তি' চলচ্চিত্রে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এর কণ্ঠে 'চরণ ধরিতে দিও গো আমারে' ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় এর 'কাঁচের স্বর্গ' ছবিতে 'ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়' গানটি চলচ্চিত্রের কাহিনির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই পরিচালনা করা হয়েছে এবং এ কথা সত্যি যে, তাতে গানটি কোনভাবেই তার স্বকীয়তা হারায়নি। এছাড়াও সেসময়কার আরও বেশ কিছু চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের সার্থক প্রয়োগ ঘটতে দেখা যায়। যেমন- 'অগ্নিশ্বর' চলচ্চিত্রে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এর কণ্ঠে 'পুরানো সেই দিনের কথা', 'মেঘে ঢাকা তারা' চলচ্চিত্রে দেবব্রত বিশ্বাস এর কণ্ঠে 'আকাশভরা সূর্যতারা', 'আলো' চলচ্চিত্রে অরুন্ধতি মুখোপাধ্যায় এর কণ্ঠে 'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার', 'শুভ মহরত' চলচ্চিত্রে মনোময় বন্দ্যোপাধ্যায় এর কণ্ঠে 'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে' প্রভৃতি।

এসকল চলচ্চিত্রে যে মূলগান হিসেবেই রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করা হয়েছে এমনটা নয়। তবে মূল ধারার গানের পাশাপাশি রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহারও চলচ্চিত্রের গুণগত মান ও দর্শকচিত্তে এই গানের সমাদর অর্জন করেছে। এরপরেও প্রায়োগিক দিক বিশ্লেষণ করলে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। যেমন- চলচ্চিত্র কি শুধুমাত্র রবীন্দ্রসংগীত দ্বারা সমৃদ্ধ নয় বা চলচ্চিত্র কি রবীন্দ্রসংগীত দ্বারা উপকৃত হচ্ছে না? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পাওয়া যায় চলচ্চিত্র ও রবীন্দ্রসংগীতের পারস্পরিক সাহচর্য। চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিল্পী নির্বাচনও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যপার। সেদিক থেকে চলচ্চিত্রকার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাঙালি শিল্পীই নির্বাচন করেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের গানে সুরের যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তার যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্য বাঙালি শিল্পীই উপযুক্ত। কেননা স্বর ও সুর প্রয়োগের বাধ্যবাধকতা ও ভাষার শুদ্ধ ও পরিশীলিত ব্যবহার সবাই করতে পারে না। এক কথায় বলা যায়, রবীন্দ্রসংগীতের যাতে যথেচ্ছাচার না হয় সে কারণেই শিল্পী নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবার অন্যদিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তের দুই শিল্পী লতা মঙ্গেশকর ও আশা ভোঁসলে চলচ্চিত্রকারদের বাঙালি শিল্পী নির্বাচনের এই বদ্ধমূল ধারণা থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন। লতা মঙ্গেশকর (১৯২৯-২০২২) ও আশা ভোঁসলে (১৯৩৩-) দীননাথ মঙ্গেশকর ও সেবন্তী মঙ্গেশকরের দুই মেয়ে।[৫] তাঁরা দুজনেই বিপুল সংখ্যক হিন্দী, মারাঠি ও অন্যান্য আরও অনেক ভাষাসহ বাংলা ভাষার সিনেমায় নেপথ্য শিল্পী হিসেবে গান করেছেন। জন্মসূত্রে ব্রিটিশ ভারতীয় হলেও বাংলা গানেও তাঁদের যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। লতা মঙ্গেশকর এর প্রথম রবীন্দ্রসংগীত ছিল

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'মধু গন্ধে ভরা'। আবার ১৯৭০ সালে 'কুহেলি' চলচ্চিত্রে আশা ভোঁসলের কণ্ঠে শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' গানটি। রবীন্দ্রনাথের গানে এমন ভিন্নভাষী শিল্পীর উপস্থিতি বিশ্বজনীন জাতীয়তাবাদী চেতনাকেও দৃপ্ততার সাথে প্রকাশ করে।

বিভিন্ন পশ্চিমা চলচ্চিত্রের পর্যালোচনার শেষে রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর মনের দোলাচল নিয়ে বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করেছেন। তিনি বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রসমূহের ব্যবহৃত সংগীতের বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করলেও চলচ্চিত্রের বহুমাত্রিকতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছেন। মোটকথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পীজীবনের শেষ পনেরো বছরে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে চলচ্চিত্রর মাধ্যমে এক নতুন দ্বার উন্মোচনের আভাস পেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শিল্পের দিগন্তকে চলচ্চিত্র নবীন মাধ্যম হিসেবে অনেকটা প্রসারিত করতে পারবে। তবে তিনি মনে করতেন, বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পর্দার দুমড়ানো মোচড়ানো কলাকৌশল চলচ্চিত্রের স্বাধীন বিবর্তন প্রক্রিয়াকে ব্যহত করে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পুত্রবধু প্রতিমা দেবীকে ১৯২৭ সালের ৩০ আগস্ট এক পত্রে লিখেছেন-

> সিদ্ধির পথে চলা দৌড়ে, সুন্দরের পথে চলা ধীরে। আধুনিক কালে সিদ্ধির লোভ প্রকাণ্ড, প্রবল। তাই আধুনিক কালের বাহনের বেগ কেবল বেড়ে যাচ্ছে। যা কিছু গভীরভাবে নেবার যোগ্য, দৃষ্টি তাকে গ্রহণ না করে স্পর্শ করেই চলে যায়। এখন হ্যমলেটের অভিনয় অসম্ভব হল, হ্যমলেটের হল জিত।[৬]

এ চিঠির আলোকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্রে ঝলমলে নৃত্যগীতের গতিময়তার আতিশয্যকে তেমন পছন্দ করতেন না। তিনি একটি সুস্থির কৃত্রিম গতি-বিবর্জিত শুধুমাত্র এই নবীন শিল্পের সৌন্দর্য আস্বাদনের রসটুকু চলচ্চিত্রে রাখতে চেয়েছেন। তাই পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা এর এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সিনেমাতে আছে রূপের সঙ্গে গতি সেই সুযোগটিকে যথার্থ আর্টে পরিণত করতে গেলে আখ্যানকে নাচে গানে দাঁড় করানো চলে'[৭]

রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র নির্মাণ নিয়ে এমন উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ সেসময় বাস্তবিক রূপ পেয়েছিল নানা পরিচালকের হাত ধরে। শুধুমাত্র এ যুগের পরিচালকরাই নন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং চলচ্চিত্র শিল্পেও নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন। তারা সবাক যুগে সরাসরি রবীন্দ্রসাহিত্যকে অবলম্বন করে অনেক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন যা রবীন্দ্র সমসাময়িক সময়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। এসব চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালকদের নামসহ কালানুক্রমিক একটি তালিকা নিচে দেয়া হল-

চলচ্চিত্র	প্রকাশের সময়	সংগীত পরিচালক
শোধবোধ	১৯৪২	অনাদি দস্তিদার
শেষরক্ষা	১৯৪৪	অনাদি দস্তিদার ও দক্ষিণামোহন ঠাকুর
দৃষ্টিদান	১৯৪৮	তিমির বরণ
মালঞ্চ	১৯৫৩	কমল দাশগুপ্ত
বউ ঠাকুরাণীর হাট	১৯৫৩	দ্বিজেন চৌধুরী
শেষের কবিতা	১৯৫৩	কালীপদ সেন (রবীন্দ্রসংগীত তত্ত্বাবধানে:অনাদি দস্তিদার)
চিত্রাঙ্গদা	১৯৫৫	পঙ্কজ কুমার মল্লিক
কাবুলিওয়ালা	১৯৫৭	রবিশংকর
যোগাযোগ	১৯৫৮	হরিপ্রসন্ন দাস
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	১৯৬০	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র	প্রকাশের সময়	সংগীত পরিচালক
ক্ষুধিত পাষাণ	১৯৬০	ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ
তিনকন্যা (পোস্টমাস্টার, সমাপ্তি, মণিহার)	১৯৬১	সত্যজিৎ রায়
অর্ঘ্য (পুরাতন ভৃত্য, পূজারিণী, অভিসার ও নটীর পূজা)	১৯৬১	সন্তোষ সেনগুপ্ত
বীরপুরুষ	১৯৬১	
সন্ধ্যারাগ (কঙ্কাল)	১৯৬১	রবিশংকর
নিশীথে	১৯৬৩	সুধীন দাশগুপ্ত
চারুলতা (নষ্টনীড়)	১৯৬৪	সত্যজিৎ রায়
সুভা ও দেবতার গ্রাস	১৯৬৪	ভি. বালসারা
অতিথি	১৯৬৫	তপন সিংহ
ইচ্ছাপূরণ	১৯৭০	অলোকনাথ দে/ বিজয় রাঘব রাও
শান্তি	১৯৭০	পবিত্র চ্যাটার্জী
মেঘ ও রৌদ্র	১৯৭০	অরুন্ধতি দেবী
মাল্যদান	১৯৭১	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
স্ত্রীর পত্র	১৯৭৩	রামকুমার চট্টোপাধ্যায়
ঘরে বাইরে	১৯৮৫	অক্ষয় কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
দিদি	১৯৮৫	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
ছেলেটা	১৯৮৬	চিন্ময় চ্যটার্জী
রবিবার	১৯৯৬	অমল নাগ
ছেলেবেলা (জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা)	২০০১	
চতুরঙ্গ	২০০৮	দেবজ্যোতি মিশ্র
মুসলমানীর গল্প	২০১০	দেবজ্যোতি বোস
ল্যাবরেটরী	২০১০	পার্থ সেনগুপ্ত[৮]

বাংলা ও বাঙালি তথা বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চায়ও বারংবার উঠে এসেছে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার। রবীন্দ্রসংগীত মূলত ধ্রুপদী ধারার হলেও তা সংগ্রামী চিত্তেও যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে তারও অনবদ্য প্রকাশ দেখা যায় চলচ্চিত্রে। ঔপনিবেশিক আমল থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রচর্চাকে বেশ উঁচু স্থানে আসীন রাখা হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তার অন্যতম একটি উদাহরণ। যদিও চলচ্চিত্রে তখন রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার একদমই দেখা যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এর প্রত্যক্ষ ব্যবহার চলচ্চিত্রে লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রসংগীত চর্চা অব্যাহত ছিল। সেই দাবির তোয়াক্কা না করে ১৯৫৭ সালে তৎকালীন শাসকদের বিরুদ্ধে 'আকাশ ও মাটি' চলচ্চিত্রে প্রথমবারের মত বিশিষ্ট শিল্পী কলিম শরাফীর দ্বারা রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ানো হয়। এরপরে ১৯৫৮ সালেও 'মাটির পাহাড়' চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালে 'যে আগুনে পুড়ি' চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ' গানটি। যা দর্শকদের উদ্বেলিত হৃদয়ে প্রশান্তির এক সাদা আবরণ টেনে

দেয়। এ গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন তৎকালীন দুই স্বনামধন্য শিল্পী নিলুফার ইয়াসমিন ও অজিত রায়। পরবর্তীকালে খ্যাতনামা পরিচালক খান আতাউর রহমান পরিচালিত 'জোয়ারভাটা' চলচ্চিত্রে একটি দৃশ্যে আবহ সংগীত হিসেবে 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ' গানটির সুর ব্যবহার করেন। এছাড়া বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসে আরেকটি রবীন্দ্রসংগীত নীরব সাক্ষী হিসেবে আজও ভাস্বর হয়ে আছে। সেটি হল জহির রায়হান পরিচালিত 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি। যাতে অভিনয় করেছেন সে সময়কার দাপুটে অভিনয়শিল্পী আনোয়ার হোসেন, রোজী সামাদ ও চিত্রনায়িকা সুচন্দা। এই গানের প্রেক্ষাপট হিসেবে চিত্রায়িত করা হয় একটি পরিবারকে। যেখানে উঠে এসেছে পশ্চিম পাকিস্তানিদের নির্মম শোষণের কথা। আর তার মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে প্রতীকস্বরূপ উপমায়িত করা হয়েছে এক গোছা চাবিকে। যা স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের অদম্য শক্তিকে নির্ভুলভাবে তুলে ধরেছেন পরিচালক। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানিদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার রবীন্দ্রনাথের ১৯০৬ সালে রচিত স্বদেশ পর্যায়ের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আর ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকরের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রথম জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া হয়। পাকিস্তানি শাসকদের সাথে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রূপায়িত হলো বাংলাদেশের স্বনামধন্য পরিচালক চাষী নজরুল ইসলামের 'ওরা এগারো জন' (১৯৭২) চলচ্চিত্রে। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার এক উজ্জ্বল প্রভাব পড়েছে এই গানে, সাথে দেশমাতৃকার অপূর্ব বন্দনাও ফুটে উঠেছে। এর অনেক পরে ১৯৯৪ সালে মুক্তি পেয়েছে হুমায়ুন আহমেদ পরিচালিত 'আগুনের পরশমণি' চলচ্চিত্রটি, যেখানে রবীন্দ্রনাথের গানের নামানুসারেই চলচ্চিত্রের নামকরণ করা হয়েছে। এ চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে' গানটিও খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে; যার সুর দীর্ঘযুদ্ধ অবসানের চিহ্ন ও নতুন সময়ের আভাস এনে দেয়। এই গানের মাধ্যমে পরিচালক যেন পাকিস্তানি শাসকদের ছোবল থেকে বাংলার স্বাধীনতার জ্যোৎস্না ছড়ানোকে স্পষ্ট রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে একথা স্বীকার্য যে, হুমায়ুন আহমেদের পূর্বে এমন কল্পনাবিলাসী, আবেগপ্রবণ ভাবানুভূতি মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে কেউ কখনও তুলে ধরেছেন বলে জানা নেই। এরপরে একুশ শতকে এসে আর তেমন কোনো রবীন্দ্রসংগীত মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রগুলোতে উল্লেখযোগ্যভাবে শোনা যায় না। তবে একথা সত্য যে, যেকোনো মুক্তিসংগ্রাম বা মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সুউচ্চে স্থাপন করার অগ্রপথিক হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমানে আবার নতুন করে রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যবহার দেখা যায় কিছু চলচ্চিত্রে। যেখানে কখনও চিত্রনাট্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গানের মাধ্যমে, আবার কখনও চিত্রনাট্যের মোড়কে নতুনত্বের সাথে সংযোগের জন্য দেখানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুবীর মণ্ডল বলেছেন,

> স্বাধীনতার অব্যবহিতপূর্বে ও পরে দুই বাংলায় রবীন্দ্রনাথের গান চলচ্চিত্রে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথিতযশা চলচ্চিত্রকার ও শিল্পীরা অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে। চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত রবীন্দ্রসংগীতে শিল্পী হিসেবে থাকতেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, মিতা হক, সাদি মোহাম্মদ, অদিতি মহসীন, কলিম শরাফী প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতকে নবরূপ দান করেছেন চলচ্চিত্রের পঞ্চপাণ্ডব। তারা হলেন- সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার ও তপন সিংহ।[৯]

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গেও পরিচালক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'ডাব চিংড়ি' চলচ্চিত্রে 'তোমায় গান শোনাবো' গানটি বেশ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ ব্যক্তিদের একটা সময়ে গিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে ঠাঁই হয়। আর তাঁদের প্রতি মানুষের ধারণাটাও পাল্টে যায় এই ভেবে যে, তাঁরা এক প্রকার অকর্মণ্য। কিন্তু অভিজ্ঞতা যে তাঁদের অন্যতম পুঁজি এবং তারা সন্তানদের কাছে অবহেলিত হলেও সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে তারই মূর্ত প্রতীক হয়ে ফুটে উঠেছে এই গানটি। চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত এমন প্রতিটি রবীন্দ্রসংগীতেরই নিজস্ব প্রেক্ষাপট রয়েছে। যা চলচ্চিত্রের কাহিনির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে চলে এবং দর্শকহৃদয়েও রেখাপাত করে চলে।

চলচ্চিত্র যাত্রার শুরুর দিক থেকে বর্তমান পর্যন্ত নানা ভাষার বিভিন্ন পরিচালকগণ চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত প্রয়োগ করেছেন। সেক্ষেত্রে অবশ্য বাংলা ভাষাভাষী চলচ্চিত্রেই এই ধারার সংগীতের সর্বাধিক প্রয়োগ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। প্রমথেশ বড়ুয়া, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, অজয় কর, ঋতুপর্ণ ঘোষ প্রমুখ ছাড়াও ওপার বাংলার অনেক প্রথিতযশা পরিচালকরাই চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করেছেন। এদের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন সত্যজিৎ রায়। তাঁর নির্মিত ২২টি চলচ্চিত্রের মধ্যে ১০টিতেই রবীন্দ্রসংগীতের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করেছেন। গানগুলো হচ্ছে: 'রবীন্দ্রনাথ' চলচ্চিত্রের 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়', 'কালী কালী বলো রে', 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু', 'মণিহার' চলচ্চিত্রের 'বাজে করুণ সুরে', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চলচ্চিত্রের 'এ পরবাসে রবে কে হায়', 'চারুলতা' চলচ্চিত্রের 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে' ও আমি চিনি গো চিনি তোমারে, 'জনঅরণ্য' চলচ্চিত্রের 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে', 'ঘরে বাইরে' চলচ্চিত্রের 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' এবং 'আগন্তুক' চলচ্চিত্রের 'বাজিল কাহার বীণা'। এসব চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায় কাহিনির সারমর্মকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলার জন্যই পূর্ণগানের ব্যবহার করেছেন। তাঁর অন্যান্য চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন রবীন্দ্রসংগীতের অংশবিশেষ। এছাড়াও তাঁর ভাবনাতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল রবীন্দ্ররচনা। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্প 'পোস্টমাস্টার', 'সমাপ্তি' ও 'মণিহারা' নিয়ে তৈরি করেছিলেন 'তিনকন্যা' চলচ্চিত্র। এছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়েও নির্মাণ করেছিলেন 'নৌকাডুবি' চলচ্চিত্র। এছাড়া বাংলাদেশেও বিমল রায়, জহির রায়হান, হুমায়ূন আহমেদ, চাষী নজরুল ইসলামসহ বাংলা ভাষাভাষী অনেক পরিচালকরাই তাঁদের নির্মিত চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার করে দর্শকদের গ্রহণযোগ্যতার মান উন্নত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে নির্মিত এসব চলচ্চিত্রে সমসাময়িক ভাবমূর্তি ফুটে উঠেছে। তাছাড়া বিভিন্ন পরিচালকদের নির্মাণশৈলীর বহুমাত্রিকতা রবীন্দ্র-রচনাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। এসব চলচ্চিত্রের বেশিরভাগই প্রথম দিকে নাটক আকারে রচিত হয়েছিল। পরবর্তীতে সেগুলোর বেশিরভাগই চলচ্চিত্রে রূপ দান করা হয়। তাছাড়া তাঁর লেখা গল্প, উপন্যাস নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশ মিলিয়ে প্রায় ৫০টিরও বেশি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। দেখা যায়, একই গল্পের চিত্রায়ণ করা হয়েছে দুই দেশেই, দুই পরিচালকের হাত ধরে। সে প্রেক্ষাপটে ১৯৯৭ সালে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অবলম্বনে ভারতীয় পরিচালক তপন সিংহ তৈরি করেন 'কাবুলিওয়ালা' চলচ্চিত্রটি। আবার ২০০৬ সালে বাংলাদেশি পরিচালক কাজী হায়াৎও পরিচালনা করেন রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে 'কাবুলিওয়ালা' চলচ্চিত্রটি। এছাড়া এ প্রজন্মে এসেও এপার বাংলায় রবীন্দ্রনাথ স্মরণে অঞ্জলি হিসেবে দিয়েছেন ২০০৫ সালে চাষী নজরুল ইসলামের 'শাস্তি' চলচ্চিত্রটি। এরপর ২০০৫ সালে আবারও তৈরি করলেন 'সুভা'। ২০১০ সালে রবীন্দ্রনাথের

আরেকটি ছোটগল্প 'সমাপ্তি' অবলম্বনে নার্গিস আক্তার পরিচালনা করলেন 'অবুঝ বউ'। ২০১২ সালে 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে চিত্রায়ণ করলেন 'চারুলতা' যার পরিচালক ছিলেন সাইফুল ইসলাম বান্নু। এসকল চলচ্চিত্রে প্রসঙ্গত অনেক জায়গায়ই পরিচালকগণ রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার সুচারুরূপেই করেছেন। তবে এসব চলচ্চিত্রে একই চিত্রনাট্য একাধিকবার ব্যবহার হলেও এর জনপ্রিয়তা বা গ্রহণযোগ্যতা কোন অংশে হ্রাস পায়নি। কারণ চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বভাবতই কাহিনির আবেদনের কথা মাথায় রেখে পরিচালকগণ চিত্রনাট্যকে সাজিয়ে তোলেন। তবে চলচ্চিত্র শিল্পে রবীন্দ্রসংগীত প্রয়োগ করতে গিয়ে বর্তমান আধুনিকতা এর প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ২০০১ সালে রবীন্দ্রসংগীতের কপিরাইট উঠে যাওয়ার পর চলচ্চিত্র ও সংগীতের ক্ষেত্রে অযাচিত কিছু অসামঞ্জস্যতা রবীন্দ্রসংগীতের আবেদনকে ব্যহত করছে। কখনো তা হয়তো নামমাত্র রাবীন্দ্রিক ঢং বজায় রাখছে আবার কখনো তা ভেঙে অতীব আধুনিকতাকে আঁকড়ে ধরছে। যা রবীন্দ্রানুরাগীদের বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলছে। এছাড়াও রবীন্দ্রসংগীতের সাথে অন্য সুরের গান মিশিয়ে নতুন গান তৈরির এক যজ্ঞ শুরু হয়েছে। যার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। উচ্চস্বরের ব্যান্ড সংগীতের সাথে রবীন্দ্রসংগীতের মিশ্রণ যেন রবীন্দ্রপ্রেমীদের কাছে এক জটিল বিড়ম্বনা। তবে রুচির এই অবক্ষয়ের যুগেও কিছু পরিচালক এখনও রবীন্দ্রসংগীতের যথার্থ প্রয়োগ করে চলেছেন। যেমন- পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'হাওয়া বদল' চলচ্চিত্রে 'মোর ভাবনারে কী হাওয়া মাতালো' গানটির মাধ্যমে এখনও রবীন্দ্রসংগীতপ্রেমীরা স্বস্তি খুঁজে পায়। দেখা যাচ্ছে, অনেক শিল্পীই রবীন্দ্রসংগীত গাইছেন কিন্তু তাতে রাবিন্দ্রীক ভাবের লেশমাত্রও নেই। কখনো অধিক নতুন যন্ত্রানুসঙ্গ পরিলক্ষিত হচ্ছে আবার কোথাও বাণী বদলে যাচ্ছে। যদিও শিল্পের নান্দনিকতা ও সার্বিক সৌন্দর্য্য দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে সার্থকতা বজায় রাখতে গিয়ে যদি অত্যাধুনিক চিন্তার উদগীরণ হয় তাহলে সেটা গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট হয়। তাই আধুনিকতাকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে বর্তমান প্রজন্মের কাছে একটি পরিশীলিত রবীন্দ্রভাবনা তুলে দেয়া উচিৎ।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ শতবর্ষ পূর্বেও তাঁর আধুনিক মন ও দূরদর্শী ভাবনা দ্বারা অনায়াসে জীবনসত্যে পৌঁছতে পেরেছিলেন। ভারতবর্ষের একশো কোটি মানুষের মধ্যে চৌদ্দ কোটি মানুষ বাংলা ভাষাভাষী। ভারতীয় উপমহাদেশের এই বিপুল বাঙালির শিল্পরস আস্বাদনে রবীন্দ্রসংগীত একটি অন্যতম মাধ্যম। রবীন্দ্রনাথের গান দুই বাংলার চলচ্চিত্রের জন্যই অন্যতম সম্পদ। রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমেই বাংলা চলচ্চিত্রের মান বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। দর্শকদের পছন্দ, অপছন্দ, গ্রহণযোগ্যতা, অগ্রহণযোগ্যতার উপরে চলচ্চিত্রের মান নির্ভর করে। তাই বলা যায়, বাঙালি দর্শক মানেই রবীন্দ্রসংগীতপ্রেমী। বাঙালি সকালবেলার চায়ের কাপের সাথে যেমন রবীন্দ্রসংগীতকে মানিয়ে নিতে পারে তেমনি জ্যোৎস্নারাতে অব্যক্ত মনের কথোপকথন হিসেবেও রবীন্দ্রসংগীতের মূর্চ্ছনায় আপ্লুত হয়। চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহারের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের যেমন মানোন্নয়ন হবে, দর্শকদের রুচিতেও আসবে পরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব ও বাণীর গভীরতাকে উপলব্ধি ও প্রসারের জন্য বর্তমানে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে। এই প্রচেষ্টায় বর্তমান প্রজন্মের কাছে একটি সুস্থ সংস্কৃতির উদাহরণ সৃষ্টি করার মাধ্যমে আনন্দময় পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব।

তথ্যনির্দেশ

১ পরিতোষ বড়ুয়া, 'ভারত উপমহাদেশ ও বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস', *উত্তরাধিকার ৭১ নিউজ*, ০৯ জুন, ২০১৫; https://m.u71news.com/article/45473/index.html last visited: july 9, 2024

২ করুণাময় গোস্বামী, *রবীন্দ্রসংগীতকলা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৩), পৃ. ২৬৮

৩ তদেব

৪ Banglapedia, https://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%9F%E0% A6%95% E0%A6%BF last visited: february 9, 2025

৫ Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Lata_Mangeshkar; last visited: july 9, 2024

৬ সোমেশ্বর ভৌমিক, *চলচ্চিত্রের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০২২), পৃ. ২৫

৭ তদেব

৮ শর্মিলা ঘোষ, *চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ* (কলকাতা: নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২), পৃ. সূচনা

৯ সুবীর মন্ডল, *ছাইলিপি*, অনলাইন পত্রিকা, ২৫ নভেম্বর, ২০২০; https://chailipi.com/% (last visited: july 9, 2024)